The Jahangirnagar Review, Part-C, Vol. XXXII, pp 301-316, ISSN 2306-3920

বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামে দৃশ্যগত যোগাযোগ মাধ্যমের ভূমিকা ও জাতীয় ঐক্যের চেতনা

রোমানা ইসলাম রুপা*

[**সার-সংক্ষেপ :** ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধ স্বাধীন বাংলাদেশের ইতিহাসে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। ত্রিশ লাখ মানুষের রক্তের বিনিময়ে আমরা অর্জন করি স্বাধীন, সার্বভৌম বাংলাদেশ। বাংলাদেশের ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধের পটভূমি তৈরি হয়েছিল সেই ১৯৪৭ সাল থেকেই যখন ভারতবর্ষ ভাগ হয়ে ভারত ও পাকিস্তান নামক দুটি রাষ্ট্র গঠিত হয়েছিল। ১৯৫২ সালে রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের মাধ্যমে বাঙালির মাঝে স্বাধিকার চেতনার উন্মেষ ঘটে। একে একে আসে '৬৬ সালের ছয় দফা আন্দোলন, '৬৯-এর গণ-অভ্যুত্থান, '৭০ সালের সাধারণ নির্বাচন, বঙ্গবন্ধু তাঁর ১৯৭১ সালের ৭ই মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণে পাকিস্তানিদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা, অবশেষে ১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর আমাদের বিজয়। গানে, কবিতায়, ছবি আঁকায়, সিনেমায় বাঙালির সৃজনশীলতার শতমুখী স্ফুরণ ঘটেছিল ওই উত্তাল সময়ে। আমাদের চারুশিল্পীরা যেমন শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন, পটুয়া শিল্পী কামরুল হাসান, শিল্পী নিতুন কুন্ডু, শিল্পী প্রানেশ মন্ডল, শিল্পী দেবদাস চক্রবর্তী তথা সত্তর দশকের চিত্রশিল্পীরা তাদের তুলির সঠিক ব্যবহার করেছিলেন দৃশ্যগত যোগাযোগ মাধ্যম যেমন : ফেস্টুন, ব্যনার, পোস্টার আকাঁর মধ্য দিয়ে। রং-তুলির আঁচড়ে ক্যানভাস রাঙিয়ে, সাত কোটি বাঙালির মাঝে স্বাধীনতার আগুন ছড়িয়ে দিয়েছিলেন সে সময়কার শিল্পীরা। তবে যেকোনো আন্দোলনে চিত্রকলা বা রং তুলির রেখাও যে প্রতিবাদের অনেক বড় হাতিয়ার হতে পারে এবং অবদান রাখতে পারে বিজয়ে তারই প্রমাণ করে আমাদের ১৯৭১ সালের আন্দোলনের নানা ঘটনাবলীর মধ্য দিয়ে। এই গবেষণা প্রবন্ধের মূল লক্ষ্য হচ্ছে, আমাদের মুক্তিযুদ্ধে শিল্পী যোদ্ধারা যে রণকৌশল প্রয়োগ করেছিলেন তার ইতিহাস পর্যবেক্ষণ ও পর্যালোচনা করার মাধ্যমে বাংলাদেশের নতুন প্রজন্মকে অপসংস্কৃতিমুক্ত রুচিশীল চিত্রকলাচর্চায় কৌতুহলী করে তোলা, সেই সাথে দেশত্ববোধ জাগ্রত করা।]

কী-ওয়ার্ড : মুক্তিসংগ্রাম, যোগাযোগ মাধ্যম, জাতীয় ঐক্য, চিকামারা, চিত্রযোদ্ধা, স্লোগান, আন্দোলন।

ভূমিকা

মুক্তিযুদ্ধ আমাদের জাতীয় জীবনের এক বড় অহংকার এবং স্মরণীয় অধ্যায়, যার পেছনে রয়েছে এক সংগ্রামী চেতনার প্রতিচ্ছবি। স্বাধীনতা হল মানুষের মৌলিক অধিকার। এ অধিকার ক্ষুন্ন হলেই জন্ম নেয় সংগ্রামী চেতনার। মহান মুক্তিযুদ্ধ ছিল আমাদের স্বপ্নপূরণের যাত্রা। পাকিস্তানি দুঃশাসনে বৈষম্য এবং বঞ্চনার বিরুদ্ধে বাংলাদেশের মানুষ অধিকার আদায়ের লক্ষ্যে যে গণতান্ত্রিক আন্দোলনের সূচনা

---

* **রোমানা ইসলাম রুপা :** সহকারী অধ্যাপক, চারুকলা বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়।

হয়েছিল তারই চূড়ান্ত বিস্ফোরণ ছিল ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধ। লড়াই ছাড়া যে মুক্তির কোনো পথ নেই সূর্যসেন থেকে শুরু করে সালাম-বরকত-রফিক-জব্বার-আসাদ-মতিউর-সার্জেন্ট জহুরুল হক নিজেদের অমূল্য প্রাণ বিসর্জন দিয়ে সে পথ দেখিয়ে গিয়েছিলেন। যেকোনো আন্দোলনের সময় একটি মহল বিশৃংঙ্খলতা সৃষ্টির চেষ্টা করে। এইরূপ কোনো পরিস্থিতি যেন না হয়, সেজন্য জনগনকে সতর্ক করার জন্য বিভিন্ন পোস্টার ও প্ল্যাকার্ড তথা যোগাযোগ মাধ্যমগুলো গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ১৯৬৯ সালে বার্তাবহনকারী ব্যনারের মাধ্যমে আন্দোলনে নবতর শক্তি সঞ্চারিত করে দিয়েছিলেন শিল্পীরা। স্বাধীনতার ডাক দিলেন বাঙালির প্রাণপুরুষ বঙ্গবন্ধু। ছাত্র, শ্রমিক, জনতা সবাই মিলিত হল স্বাধীনতা নামক লালিত স্বপ্ন পূরণের জন্য। যে যেভাবে পেরেছে তার জায়গা থেকে অংশগ্রহণ করেছে মুক্তিযুদ্ধে। লেখক, গায়ক, কলামিস্ট, বুদ্ধিজীবী যার যার জায়গা থেকে অংশগ্রহণ করেন মহান মুক্তিযুদ্ধে। গায়করা গান গেয়ে মুক্তিযোদ্ধাদের চেতনাকে জাগ্রত করেছেন। তেমনি এদেশের চারুশিল্পী সমাজও এগিয়ে আসেন মহান মুক্তিযুদ্ধের যোদ্ধা হিসেবে হাতে রং-তুলির অস্ত্র নিয়ে, প্রেরণা জোগান মুক্তিযোদ্ধাদের।

মুক্তিসংগ্রামে পটভূমি

একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ আমাদের জাতীয় ইতিহাসের শ্রেষ্ঠতম অধ্যায়। এই মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে জন্মলাভ করে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ। ১২ আগস্ট প্রকাশিত র‍্যাডক্লিপ রোয়েদাদে পূর্ব বঙ্গ ও পশ্চিম বঙ্গের মধ্যে সীমানা আনুষ্ঠানিকভাবে নির্ধারিত হয়। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠা হলো ১৯৪৭ সালের ১৪ আগস্ট। পূর্ব বাংলা হয় পাকিস্তানের অংশ যার নাম দেওয়া হয় 'পূর্ব পাকিস্তান'। পূর্ববাংলার জনগণ আশা করেছিলেন, এবার তাঁদের আশা-আকাঙ্খা পূরণ হবে। তাঁদের প্রত্যাশিত স্বাধীন নতুন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হবে। উন্নত জীবনের অধিকারী হবে। কিছুদিনের মধ্যেই পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ অনুভব করে, তাদের প্রত্যাশা পূর্ণ হওয়ার নয়। কারণ, পাকিস্তানের শাসকবর্গ সমাজে পূর্ব পরিকল্পিত ঐক্যবদ্ধ একক সংস্কৃতি প্রতিষ্ঠার ষড়যন্ত্র করতে থাকে। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের অংশগ্রহণের ক্ষেত্র সংকুচিত করা হয়। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে তারা বঞ্চনার শিকার হয়। এমন কি পূর্ব পাকিস্তানের সম্পদে পশ্চিম পাকিস্তানের উন্নয়ন নিশ্চিত করার ব্যবস্থা করা হয়। ফলে র্পূব পাকিস্তানে স্বাধীনতা সংগ্রামের পটভূমি তৈরি হয়। পূর্ব পাকিস্তানের ছাত্র জনতাকে ১৯৫২ সালে নিজস্ব ভাষার অধিকার রক্ষার জন্য জীবন দান করতে হয়। ১৯৫৮ সালে জেনারেল আইয়ুব খান সামরিক শাসন জারি করে ক্ষমতা দখল করে। ১৯৬৬ সালের ৫ ফেব্রুয়ারি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান বাঙ্গালির স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠা করার লক্ষ্যে ছয় দফা দাবি পেশ করেন। পাকিস্তানে ১৯৭০ সালের ৭ ডিসেম্বর সর্বপ্রথম অনুষ্ঠিত সাধারণ নির্বাচনে পূর্ব পাকিস্তানের রাজনৈতিক দল আওয়ামী লীগ একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে জয়লাভ করে। জনগণ প্রত্যাশা করেছিল নির্বাচিত রাজনৈতিক দল আওয়ামী লীগ সরকার গঠন করে পূর্ব পাকিস্তানের দীর্ঘদিনের বঞ্চনার ইতিহাসের পরিবর্তন করবে। এই সংকটময় সময়ে ৭ই মার্চ ১৯৭১, বেলা ২টায় রেসকোর্স মাঠে বঙ্গবন্ধু বজ্রকন্ঠে ঘোষণা করেন:

> "ভায়েরা আমার, আজ দুঃখ ভারাক্রান্ত মন নিয়ে আপনাদের সামনে হাজির হয়েছি। আপনারা সবই জানেন এবং বোঝেন। আমরা আমাদের জীবন দিয়ে চেষ্টা করেছি। কিন্তু দুঃখের বিষয়, আজ ঢাকা, চট্টগ্রাম, খুলনা, রাজশাহী, রংপুরে আমার ভাইয়ের রক্তে রাজপথ রঞ্জিত হয়েছে। আজ বাংলার মানুষ মুক্তি চায়, বাংলার মানুষ বাঁচতে চায়, বাংলার মানুষ তার অধিকার চায় ... প্রত্যেক গ্রামে, প্রত্যেক মহল্লায় আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে সংগ্রাম পরিষদ গড়ে তোল এবং তোমাদের যা কিছু আছে, তাই নিয়ে প্রস্তুত থাকো। রক্ত যখন দিয়েছি, আরো রক্ত দেবো। এ দেশের মানুষকে মুক্ত করে ছাড়বো ইনশাল্লাহ। এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম, জয় বাংলা।" (বাংলাপিডিয়া, ১৩)

পাকিস্তানের শাসকবর্গ ও কিছু রাজনৈতিক নেতা এবং কিছু সামরিক কর্মকর্তা ষড়যন্ত্র করেন যেন শাসন ক্ষমতা কোনোক্রমে বাঙ্গালির হস্তগত না হয়। কিন্তু, পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ তা সঠিকভাবে অনুধাবন করেন। পূর্ব পাকিস্তানের সৃষ্ট রাজনৈতিক অসন্তোষ ও সাংস্কৃতিক জাতীয়তাবাদ অবদমনে পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকেরা ১৯৭১ খ্রিষ্টাব্দের ২৫শে মার্চ রাতে নৃশংস গণহত্যা আরম্ভ করে, যা অপারেশন সার্চলাইট নামে পরিচিত। পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর নির্মম আক্রমণের পর ২৬শে মার্চ প্রথম প্রহরে আওয়ামী লীগ নেতা শেখ মুজিবুর রহমান পূর্ব পাকিস্তানের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। অধিকাংশ বাঙালি স্বাধীনতার ঘোষণাকে সমর্থন করলেও কিছু ব্যক্তিবর্গ ও পূর্ব পাকিস্তানে বসবাসরত বিহারিরা এর বিরোধিতা করে এবং পাকিস্তান সেনাবাহিনীর পক্ষ অবলম্বন করে। পাকিস্তানের রাষ্ট্রপতি মোহাম্মদ ইয়াহিয়া খান সেনাবাহিনীকে দেশের পূর্ব অংশে পাকিস্তানের নিয়ন্ত্রণ করার নির্দেশ দেন, যার ফলে গৃহযুদ্ধের সূচনা ঘটে। যুদ্ধের ফলে প্রায় এক কোটি মানুষ ভারতের পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্যসমূহে শরণার্থী হিসেবে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়। ক্রমবর্ধমান মানবিক ও অর্থনৈতিক সংকটের মুখে ভারত মুক্তিবাহিনীর সহযোগিতায় মুক্তিযুদ্ধে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করতে থাকে।

শুরু হয় আমাদের ইতিহাসের এক অবিস্মরণীয় অধ্যায় একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ। এই যুদ্ধের মধ্য দিয়ে এ ভূ-খন্ডের অধিবাসীদের দীর্ঘদিনের লালিত স্বপ্ন বাস্তবায়িত হয়েছিল। রক্ত আর অশ্রুতে, বীরত্ব আর বেদনায়, প্রতিজ্ঞা আর প্রতিরোধে সে ছিল আমাদের এক অনন্য অভ্যুদয়। আমাদের গর্ব ও গৌরবের কাল। দেশের সর্বস্তরের জনগোষ্ঠীর সঙ্গে আমাদের শিল্পীসমাজ সেদিন দেশমাতৃকার মুক্তিব্রত উদযাপনে এগিয়ে এসেছিলেন। তাঁরা তাঁদের রং তুলিকে সেদিন পরিয়ে দিয়েছিলেন রণসজ্জা। শিল্পীদের কেউ কেউ আবার হাতে তুলে নিয়েছিলেন আগ্নেয়াস্ত্র। সরাসরি যুদ্ধ করেছিলেন শত্রুর বিরুদ্ধে। তুলির একেকটি আঁচড় কাঁপন ধরিয়েছিল ইয়াহিয়ার সরকারকে, এক একটি পোস্টার যেন বিস্ফোরক হয়ে হাজির হয়েছিল পাকিস্তানের সামনে। আর মনস্তাত্ত্বিকভাবেও প্রেরণা জুগিয়েছিল বাংলার মুক্তিযোদ্ধাদের, সারা বিশ্ব জানতে পেরেছিল বাংলাদেশের অবস্থা।

চিত্রশিল্পীরা যখন চিত্রযোদ্ধা

একাত্তরের অনেক আগে থেকেই জাতিসত্তা ও রাষ্ট্রসত্তার অন্বেষণে এই ভূ-খন্ডের জনগণদের যাত্রা শুরু হয়েছিল। মুক্তির সংগ্রাম তারই এক দীর্ঘ ধারাবাহিকতার গৌরবময় ঐতিহ্য ধারণ করে ধাপে ধাপে চূড়ান্ত পর্বে উপনীত হয়েছিল। ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর থেকেই এই রাষ্ট্রের বিরোধী ও প্রতারক চরিত্র দেশবাসীর কাছে প্রকাশিত হয়ে যায়। মোহাম্মদ আলি জিন্নাহর রাষ্ট্রভাষা সংক্রান্ত বিতর্কিত বক্তব্য খুব সহজেই পাকিস্তানি ভাবাদশের প্রকৃত রূপটিকে চিনিয়ে দেয়। উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা করার স্বৈরাচারী ঘোষণা একটি সত্যকে উন্মোচিত করে, আর তা হলো পাকিস্তান বাঙালিদের জন্য আসেনি। ১৯৪৮ থেকে ১৯৫২ সাল পর্যন্ত দেশজুড়ে নানা মাত্রায় শাসকশক্তির বিরুদ্ধে আন্দোলন হয়েছিল। ১৯৫২ সালের একুশে ফেব্রুয়ারি ভাষা শহীদদের পবিত্র রক্তে আমাদের সেই অভিযাত্রা মহিমান্বিত হয়ে ওঠে। তারপর পূর্ব থেকে পূর্বাস্তরে দীর্ঘ ধারাবাহিক সংগ্রামের পর আসে একাত্তর। একুশ থেকে একাত্তর, আত্মপরিচয়ের অন্বেষণে, স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার একাগ্রতায় ধাপে ধাপে এগিয়ে যাওয়ার উপাখ্যান। আর এই কালপর্বের প্রতিটি অধ্যায়েই আমাদের শিল্পীসমাজ স্বদেশের আহ্বানে সাড়া দিয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন। ভাষা আন্দোলন থেকে শুরু করে মুক্তিযুদ্ধ পর্যন্ত তাঁদের অবদান অনস্বীকার্য।

বাংলাদেশের আধুনিক চিত্রকলার ইতিহাস ছয় দশকেরও কম সময়ের। পাকিস্তান-উত্তর সময়ে আমাদের শিল্পীসমাজ বহুপথ পাড়ি দিয়ে একাত্তরের লড়াইয়ে নিজেদের সম্পৃক্ত করেছিলেন। বস্তুত চিত্রকলার ব্যাপারটাই ছিল পাকিস্তানি বিরুদ্ধে একটি জাগ্রত চেতনা। সে জন্যই পাকিস্তানি চিন্তাধারার ধারক ও বাহকরা সর্বদাই এর বিরোধিতা করেছে। এদেশে চারুকলা কলেজ প্রতিষ্ঠাতেও তারা

নানাভাবে বাধা দিয়েছে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তারা জয়ী হতে পারেনি। নানা বাধা এড়িয়ে অবশেষে ১৯৪৮ সালে শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন ও তাঁর কলকাতার সহযোগী শিল্পী-বন্ধুদের উদ্যোগে ঢাকায় সরকারি চারুকলা ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠা থেকে এর আনুষ্ঠানিকতা শুরু হয় এবং বাঙালির আত্মপরিচয় লাভের সংগ্রামে প্রতিষ্ঠানটি অসাধারণ ভূমিকা পালন করেছে। উপমহাদেশের মুসলিম সমাজের প্রতিনিধিত্বকারী পাকিস্তান রাষ্ট্রের একেবারে শুরুতেই, মাত্র এক বছরের মধ্যে চারুকলা ইনস্টিটিউটের প্রতিষ্ঠা ছিল রীতিমতো একটি বিপ্লবী ঘটনা। তারপর আর দু-চার বছরের মধ্যেই এর পাশাপাশি (১৯৫০ সালে) সম্পূর্ণ ব্যক্তি-উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ঢাকা আর্ট গ্রুপ নামের শিল্পীদের একটি নিজস্ব সংগঠন। ইনস্টিটিউটের প্রাণপুরুষ ছিলেন শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন, আর্ট গ্রুপের মূল উদ্যোক্তা ছিলেন শিল্পী কামরুল হাসান। দুটো সংস্থার পরিপূরক আয়োজন প্রথম থেকেই ঢাকার চারুশিল্প আন্দোলনকে অত্যন্ত অর্থবহ ও বেগবান করেছে। প্রতিবছর দলে দলে এই কলেজ থেকে শিল্পীরা বেরিয়ে এসেছেন, আর্থসামাজিক ও রাজনৈতিক অঙ্গনে যে নানাবিধ তৎপরতা চলছিল, তাঁরা তাতে এসে যোগ দিয়েছেন। ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়, সাংস্কৃতিক সংগ্রামের প্রতিটি প্রবাহে নতুন মাত্রা যুক্ত করে তাকে আরো গতিময় করে চলেছেন চিত্রশিল্পীরা। শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন চারুকলা ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠার সময় এর মূল উদ্যোক্তা ছিলেন। তিনি অত্যন্ত বিচক্ষণতার পরিচয় দিয়েছিলেন সঙ্গে ড. মুহম্মদ কুদরাত-এ-খুদার মতো শ্রদ্ধাভাজন বিজ্ঞানী ও শিক্ষাবিদ ও উদারমনা সরকারি কর্মকর্তা সলিমউল্লাহ ফাহমীর মতো মানুষের সমর্থন নিশ্চিত করে। একইভাবে ঢাকা আর্ট গ্রুপ প্রতিষ্ঠার সময় শিল্পী কামরুল হাসান, শিল্পী জয়নুল আবেদিনসহ অভিভাবক ও সহযোগী হিসেবে পেয়েছিলেন সৈয়দ আলী আহসান, অজিত গুহ, আবদুল গণি হাজারি, সরদার জয়েনউদ্দিন, মুনীর চৌধুরী, সানাউল হক, সিকান্দার আবু জাফর, আবদুল আহাদ, সৈয়দ নুর উদ্দিন, খান সারওয়ার মুর্শিদ ও অন্যান্যের মতো প্রগতিশীল অধ্যাপক, কবি, লেখক ও সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্বদের। ঢাকা আর্ট গ্রুপ একটি আধুনিক শিল্প সংগঠন হিসেবে যাত্রা শুরু করে। এক বছরের মধ্যেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের তৎকালীন ঢাকা হলে ৩৪ জন শিল্পীর ২৭৪টি ছবি নিয়ে ঢাকা আর্ট গ্রুপের প্রথম প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয় (জানুয়ারি ১৯৫১)। প্রদর্শনীটি উদ্বোধন করেছিলেন পূর্ব বাংলা (তখন এটাই ছিল প্রদেশের নাম) সরকারের উজিরে আলা জনাব নুরুল আমিন। এটি ছিল ঢাকার চিত্রকলা আন্দোলনের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। (সিদ্দিকা, ২০১৮)

পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পেছনে মুসলিম জাতীয়তাবাদী চেতনার প্রবল প্রভাব থাকলেও বছর না ঘুরতেই তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের মানুষ বিকল্প পথ ধরতে উদ্যোগী হয়েছিল। রাষ্ট্রভাষা হিসেবে তাদের মাতৃভাষা বাংলার ন্যায্য মর্যাদার দাবিই এ ক্ষেত্রে মূল প্রেরণা ও শক্তি হিসেবে কাজ করে। উদারপন্থী রাজনৈতিক নেতৃত্বের পাশাপাশি প্রগতিশীল বুদ্ধিজীবী ও ছাত্র-শিক্ষকরাই এতে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে প্রতিষ্ঠার দাবি গণআন্দোলনে রূপ পেতে থাকে এবং পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার মাত্র সাড়ে তিন বছরের মধ্যে ১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারির মতো মর্মান্তিক ঐতিহাসিক ঘটনা ঘটে, বাঙালি জাতীয়তাবাদী আন্দোলন প্রকৃত রূপ পেতে থাকে। এই আন্দোলনে ঘনিষ্ঠ সম্পৃক্ততা ছিল তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের শিল্পীদের নেতৃস্থানীয় বড় এক অংশের। সরকারি আর্ট ইনস্টিটিউটের প্রথম ব্যাচের ছাত্র যেমনঃ আমিনুল ইসলাম, বিজন চৌধুরী প্রমুখ শুরু থেকেই বাম ধারার রাজনৈতিক চেতনার সঙ্গে একাত্ম, দ্বিতীয় ব্যাচের ছাত্র মুর্তজা বশীর, ইমদাদ হোসেন, রশিদ চৌধুরী প্রমুখ একই ভাবধারায় উদ্বুদ্ধ ছিলেন। তাঁদের অন্য সতীর্থরাও তেমনভাবে বামপন্থী না হলেও নিশ্চিতভাবে উদার প্রগতিবাদী চিন্তাচেতনার অনুসারী ছিলেন। চারুশিল্পকে জনগণের কাছাকাছি নিয়ে যাওয়ার জন্য ঢাকা আর্ট গ্রুপের দ্বিতীয় প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়েছিল (মার্চ ১৯৫২)। বাংলা ভাষা তথা সংস্কৃতিভিত্তিক বাঙালি জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের পাশাপাশি চিত্রকলার আধুনিক বা পাশ্চাত্য শিল্পধারার প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিল বাংলাদেশের প্রথম শিল্পীসমাজ। পঞ্চাশের দশকে পূর্ব পাকিস্তানের

(তথা পাকিস্তানের) রাজনৈতিক মঞ্চে খুব দ্রুত একাধিক দৃশ্যবদল ঘটেছে। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার অগ্রণী রাজনৈতিক দল ইসলামী ভাবধারার মুসলিম লীগের শোচনীয় পরাজয় ও গণতান্ত্রিক উদারনৈতিক যুক্তফ্রন্টের ক্ষমতা লাভ ও হারানো, মার্শাল'ল ও সামরিক শাসনের প্রতিষ্ঠা সবই এক দশকের মধ্যেই সংঘটিত হয়। এই পটভূমিতেই বাংলাদেশের চিত্রকলা আন্দোলন এগিয়ে যেতে থাকে। স্বভাবতই চিত্রকলার বৈশিষ্ট্য নির্মাণে সমসাময়িক রাজনৈতিক-সামাজিক পরিবেশ-পরিস্থিতি যথেষ্ট প্রভাব রেখেছিল।

মুক্তিসংগ্রামে দৃশ্যমাধ্যমের ভূমিকা (১৯৪৮ সাল থেকে ১৯৭১ সাল)

যেকোন আন্দোলন সংগ্রামের অপরিহার্য উপাদান হল যোগাযোগ মাধ্যম। এসব যোগাযোগ মাধ্যমের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল লিফলেট, পোস্টার, ফেস্টুন। এসব লিফলেট বা পোস্টার বা ফেস্টুন তৈরী করা হয় বিভিন্ন প্রেক্ষিতে যেমন: উদ্দীপনামূলক, ঘৃণামূলক, দাবীমূলক, শুভকামনামূলক ও পরিচিতিমূলক লেখা দিয়ে যা, আন্দোলনের কর্মসূচি, লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে জনমত গঠন করে। পৃথিবীর দেশে দেশে যত আন্দোলন সংগ্রাম ও বিপ্লব সাধিত হয়েছে, সব ক্ষেত্রেই যোগাযোগের মাধ্যমগুলো ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করেছে। আমাদের রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের শুরু থেকেই পোস্টার, লিফলেট লেখার প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। আন্দোলনের গতি যতই প্রবল ও বেগবান হয়েছে, ততই যোগাযোগ মাধ্যমের ভাষাও হয়েছে জ্বালাময়ী। মুক্তিসংগ্রামে ব্যবহৃত বিভিন্ন দৃশ্যগত যোগাযোগ মাধ্যমগুলোর পর্যায়ক্রমে আলোচনা করা হল:

১৯৪৮ : ২৫শে ফেব্রুয়ারি ১৯৪৮ সালে পাকিস্তান গণপরিষদে পূর্ববঙ্গের কংগ্রেসদলীয় সদস্য ধীরেন্দ্রনাথ দত্তের ভাষাবিষয়ক সংশোধনী প্রস্তাব নাকচ হয়ে গেলে ছাত্ররা প্রতিবাদী মিছিল বের করে এবং ধর্মঘটসহ নানা কর্মসূচির আয়োজন করে। কর্মসূচির পক্ষে জনমত গঠনে যেমন বজ্রকণ্ঠে স্লোগান তোলা হয় তেমন লেখা হয় বিভিন্ন দাবিসংবলিত পোস্টার। তখন মুদ্রণশিল্প এত উন্নত ও সহজলভ্য না হওয়ায় বেশির ভাগ পোস্টার হাতে লিখে দেয়ালে দেয়ালে টাঙিয়ে দেওয়া হয় এবং জনসাধারণের মধ্যে বিলি করা হয়।

চিত্র ০১ : শিক্ষা ... কুঠারাঘাত পোস্টার

১৯৪৮ সালের **১১ই** মার্চ পুরানো ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলা ভবনের পিছনে (বর্তমান ঢাকা মেডিকেল কলেজ) বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসেবে স্বীকৃতির দাবিতে ছাত্র-জনতার সচিবালয়মুখী মিছিল প্ল্যাকার্ডে লেখা ছিল 'শিক্ষা ও কৃষ্টির গোড়ায় কুঠারাঘাত' (চিত্র ০১)। **১৯৪৮** সালের **১১ই** মার্চ ধর্মঘটের পর আন্দোলন তীব্র আকার ধারণ করলে পূর্ববঙ্গের প্রধানমন্ত্রী কৌশলী হন। পাকিস্তানের গভর্নর জেনারেল মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর আসন্ন ঢাকা সফর নির্বিঘ্ন করতে এবং আন্দোলন শিথিল করতে ছাত্রনেতাদের সঙ্গে আট দফা সমঝোতা চুক্তি স্বাক্ষর করেন।

১৯৫২ : পাকিস্তানের গভর্নর জেনারেল মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ চুক্তির শর্ত ভঙ্গ করে নিজেই **১৯৫২** সালের ২৭শে জানুয়ারি ঢাকার পল্টন ময়দানে মুসলিম লীগ আয়োজিত এক জনসভায় উর্দুকে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা করার ঘোষণা দেন। ছাত্রনেতাদের সঙ্গে এভাবে বিশ্বাস ঘাতকতা করায় তাঁরা আন্দোলন শুরু করে। তখন রাজপথে প্রতিবাদী স্লোগান ওঠে, তেমনি পোস্টারের ভাষায়ও ঘটে এর প্রতিফলন। একটি পোস্টারে লেখা হয়: 'নাজিম! চুক্তি পালন কর-নইলে গদি ছাড়', 'রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম, আমাদের জীবন-সংগ্রাম' (চিত্র ০২)। দেশব্যাপী ধর্মঘট কর্মসূচি ঘোষিত হলে আন্দোলন তীব্ররূপ ধারণ করে। ঢাকা ও ঢাকার বাইরে কর্মসূচি সফল করতে সর্বাত্মক প্রস্তুতি গ্রহণ করা হয়। পোস্টার ও লিফলেটে ছেয়ে ফেলা হয় বিভিন্ন ভবনের দেয়াল ও প্রাচীর। ছাত্রনেতারা পুলিশের চোখ ফাঁকি দিয়ে বিভিন্ন হল, ছাত্রাবাস ও বাসভবনে মুর্তজা বশীর, ইমদাদ হোসেনসহ চারুকলার ছাত্ররা বিভিন্ন আলপনা এবং নকশা সংবলিত পোস্টার ও ছাপচিত্র আঁকেন। পোস্টার লিখিয়েদেও একজন

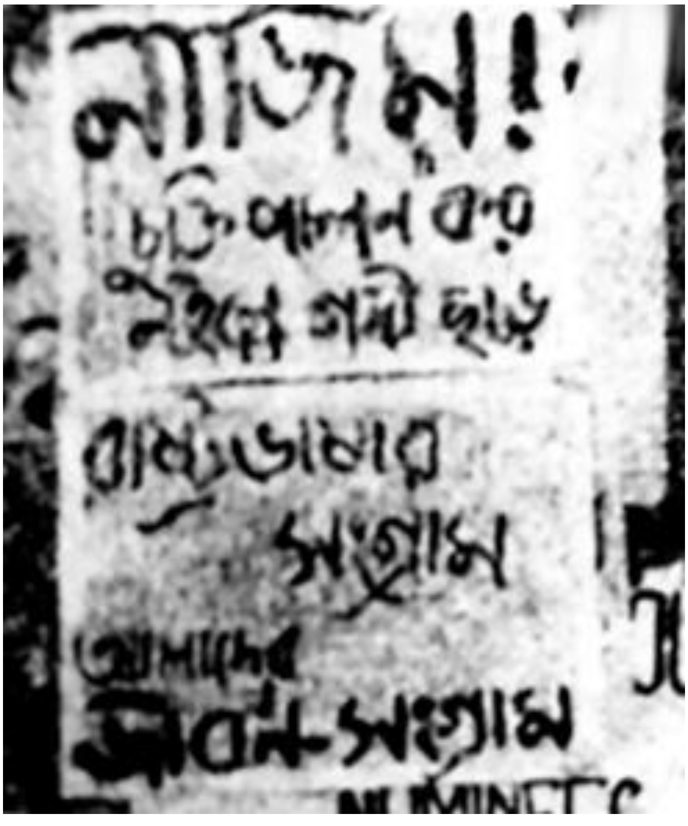

চিত্র ০২ : 'নাজিম ! চুক্তি ... সংগ্রাম' পোস্টার

চারুকলার তৎকালীন ছাত্র (পরবর্তীকালে খ্যাতিমান) শিল্পী ইমদাদ হোসেন লিখেছেন : 'রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই', 'কথা বলার অধিকার দিতে হবে'। আন্দোলনের মিছিলে গুলিবর্ষণের পর পোস্টারের ভাষা আরো বিপ্লবী হয়। 'খুনি নূরুল আমীনের কল্লা চাই', 'রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই' ইত্যাদি ইলাস্ট্রেশন করা পোস্টারও লিখেছেন। ছাত্রদের পাশাপাশি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রীরাও পোস্টার লিখেছেন। ইতিহাস বিভাগের তখনকার ছাত্রী সারা তৈফুর ছিলেন এঁদের একজন। বায়ান্নর সেই ঐতিহাসিক ঘটনার স্মৃতিচারণা করে তিনি লিখেছিলেন :

> "মাতৃভাষার দাবিতে পুরো বিশ্ববিদ্যালয় তখন সোচ্চার হয়ে উঠেছে। আমি নিজেও বাংলা ভাষার দাবিতে সোচ্চার হয়ে উঠি। এস এম হলের ছাত্ররা কাগজ ও কালি দিয়ে যেত, আমরা পোস্টার লিখতাম 'নাজিমুদ্দীন গদি ছাড়ো', 'রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই' (চিত্র ০২) ইত্যাদি স্লোগানে।" (আহমেদ, ২০২২)

১৯৫২ সালে ভাষা আন্দোলনের সময়কালে জেলে আটক থাকায় আন্দোলনে সক্রিয় অংশগ্রহণ করতে পারছিলেন না বঙ্গবন্ধু। তবে আন্দোলনের নেতাদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতেন জেলে থেকেই। ১৯৫২ সালের ১৬ ফেব্রুয়ারি ফরিদপুর জেলে যাওয়ার আগে ও পরে ছাত্রলীগের একাধিক নেতাকে তিনি চিরকুট পাঠিয়েছেন। ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি বঙ্গবন্ধু ফরিদপুর জেলে ছিলেন। রাতে জানতে পারেন আন্দোলনে কয়েকজন লোক গুলি খেয়ে মারা গিয়েছে। ফরিদপুরে ছাত্র-ছাত্রীরা 'রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই', 'বাঙালিদের শোষণ করা চলবে না', 'শেখ মুজিবের মুক্তি চাই', 'রাজবন্দিদের মুক্তি চাই' এসব স্লোগান দিচ্ছিলেন। ২২ তারিখের খবরের কাগজ পড়ে তিনি বিস্তারিত জানতে পারেন। বঙ্গবন্ধু খুব চিন্তিত হয়ে পড়েন, এ বিষয়ে বঙ্গবন্ধুর বর্ণনা ছিল,

> "মাতৃভাষার আন্দোলনে পৃথিবীতে এই প্রথম বাঙালিরাই রক্ত দিল। দুনিয়ার কোথাও ভাষা আন্দোলনের গুলি করে হত্যা করা হয় নাই। ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করলেও, গুলি না করে গ্রেফতার করলেই তো চলতো। আমি ভাবলাম, দেখব কি না জানি না, তবে রক্ত যখন আমাদের ছেলেরা দিয়েছে তখন বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা না করে আর উপায় নাই। মানুষের যখন পতন আসে তখন পদে পদে ভুল হতে থাকে।" (হোসাইন, ২০২২)

১৯৫২ সালে ভাষা আন্দোলনের সময়কালে সমগ্র বাংলাদেশে মিছিলে স্লোগানের মধ্যে প্রধান ছিল 'রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই'। এই স্লোগানের দাবি একসময় বাংলার মানুষের প্রাণের দাবিতে পরিণত হয়। শিল্পী মুর্তজা বশীর ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারির মিছিলে পুলিশের গুলিবিদ্ধ আন্দোলনকারী এমন বিষয়বস্তু নিয়ে ছাপা মাধ্যমে পোস্টার তৈরি করেন (চিত্র ০৩)। যা প্রকাশিত হয়েছিল ১৯৫৩ সালের সাপ্তাহিক দৈনিকে।

চিত্র ০৩ : ১৯৫২ ভাষা আন্দোলনের মিছিলে পুলিশের গুলিবিদ্ধ আন্দোলনকারীর চিত্র

১৯৬২ : সামরিক সরকারের প্রতিক্রিয়াশীল শিক্ষানীতি চালুর উদ্দেশ্যে শিক্ষা কমিশনের যে রিপোর্ট কার্যকরী করার চেষ্টা চলছিল বাষট্টির ছাত্র আন্দোলন ছিল তার প্রতিবাদ স্বরূপ। শিক্ষা কমিশনের রিপোর্ট বাতিলের দাবীতে জুলাই মাস থেকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে এই আন্দোলন শুরু হয় এবং সমগ্র পূর্ব পাকিস্তানের ছাত্র সমাজ এই আন্দোলনে যোগ দেয়। এই সময় আন্দোলনরত ছাত্ররা স্লোগান দেয় 'শরীফ কমিশন রিপার্টে বাতিল কর বাতিল কর', 'হামিদুর রহমান শিক্ষা কমিশন বাতিল কর, বাতিল কর', 'ছাত্র ঐক্য জিন্দাবাদ, জিন্দাবাদ', 'শিক্ষার ক্ষেত্রে বৈষম্য চলবে না', 'সামরিক শাসন মানি না মানি না' (চিত্র ০৪)। এসময় ছাত্রলীগ-ছাত্র ইউনিয়নের নেতৃত্বে আইয়ুব বিরাধৌ আন্দোলন তীব্র হয়ে উঠে। ক্রমাগত পাঁচ দিন একের পর এক বিক্ষোভ চলতে থাকে। এই অবস্থায় কৌশলগত কারণে ছাত্ররা মিছিল বের করা থেকে বিরত থাকে। তবে শহরের বড় বড় দেওয়ালগুলি গভীর রাতে স্লোগান লিখা চলমান থাকে 'ডাউন উইথ মার্শাল'ল, সামরিক শাসন নিপাত যাক'।

১৯৬২ এর ছাত্র আন্দোলনের সময় শামসুজ্জামান চৌধুরী, আবুল কালাম আজাদ, সায়েদুল হক সাদু প্রমুখ ছাত্র নেতারা স্লোগান দিতেন 'পিণ্ডি না ঢাকা, ঢাকা ঢাকা', 'জাগো জাগো বাঙালি জাগো'। এ ছাত্র আন্দোলন গণআন্দোলনের ইতিহাসে নতুন দুটো বিষয়ের সঙ্গে পরিচয় করে দেয়। এর একটি হল দেওয়াল লিখনের সাংকেতিক নাম 'চিকামারা' শব্দের উদ্ভাবন। রাতে দেওয়াল লিখনের সময় রাস্তায় ছাত্রদের জটলা দেখে পুলিশ জিজ্ঞাসা করলে ছাত্ররা উত্তর দিতো 'চিকা মারছি'। সেই থেকে আন্দোলনকারীদের নিকট দেওয়াল লিখনের সাংকেতিক নাম হয়ে যায় 'চিকামারা'। এই সময় আইয়ুবের ঢাকা আগমনকে কেন্দ্র করে ছাত্রদের মধ্যে বিরাট আন্দোলনের সৃষ্টি হয়। ছাত্ররা ঢাকা শহরের প্রায় সকল দেওয়াল 'Down AYUB' লিখে ভরে ফেলে। আরেকটি বিষয় হলো 'জ্বালো জ্বালো আগুন জ্বালো' স্লোগানের উৎপত্তি। এই দেশের সভা-সমাবেশের অত্যন্ত জনপ্রিয় স্লোগান হলো, 'জ্বালো জ্বালো আগুন জ্বালো'। সেই থেকে এখনোও বিভিন্ন মিছিল সমাবেশে সবাইকে চমকিত করে স্লোগান ওঠে 'জ্বালো জ্বালো আগুন জ্বালো, দিকে দিকে আগুন জ্বালো'। (রহমান, ২০১৮)

চিত্র ০৪ : ১৯৬২ সালে আইয়ুবের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ সমাবেশে ব্যবহৃত পোস্টার, ব্যনারের স্লোগান

১৯৬৬ : শেখ মুজিব ১৯৬৬ সালে লাহারে এসে ৬-দফা প্রস্তাব পেশ করেন। বাংলার স্বাধীনতার পক্ষে প্রথম কার্যকরী পদক্ষেপ হচ্ছে ৬-দফা। সত্যিকার অর্থে ৬-দফা স্বাধীনতার প্রথম স্মারক। ৬-দফা

পেশের সময় শেখ মুজিব পূর্ব পাকিস্তানের সিএসপি অফিসার জনাব রুহুল কুদ্দুসকে ডেকে বলেছিলেন, 'আসলে ৬-দফা নয়, এক দফা ঘুরিয়ে বললাম শুধু'। এখান থেকেই বাঙালির মুক্তি সংগ্রাম নতুনভাবে গতিলাভ করে। ১১ ফেব্রুয়ারি শেখ মুজিব দেশে ফিরে এলেন তরুণ কর্মীরা 'বাঙালির দাবী ৬-দফা', 'বাঁচার দাবী ৬-দফা', '৬-দফার ভেতরে পূর্ব পাকিস্তানের স্বায়ত্বশাসন নিহিত' ইত্যাদি স্লোগানে লেখা পোস্টারে, চিকামারায় দেওয়াল ছেয়ে ফেলে। ২০শে মার্চ পল্টন ময়দানে ৬-দফা ঘোষণার মঞ্চ স্থাপন করা হয়। এই জনসভায় ভাষণ দেন শেখ মুজিবুর রহমান। উক্ত সভার মঞ্চে শেখ মুজিবের পিছনের ব্যানারের শ্লোগান ছিল : 'জাগো জাগো বাঙালি জাগো', 'তোমার আমার ঠিকানা পদ্মা মেঘনা যমুনা'। এই সময় পূর্ব পাকিস্তানে ৬-দফার দাবীতে দেশব্যাপি ৭ই জুন হরতাল পালিত হয়। হরতালে পুলিশের গুলিতে শতাধিক হতাহতসহ গ্রেফতার হয় সহস্রাধিক। এই সময় সমগ্র বাংলাদেশ 'পাকিস্তান না বাংলাদেশ বাংলাদেশ, বাংলাদেশ', '৬-দফা মানতে হবে নইলে গদি ছাড়তে হবে', 'পূর্ব বাংলাকে শোষোণ করা চলবে না' ইত্যাদি স্লোগানে মুখরিত ছিল।

চিত্র ০৫ : ১৯৬৬ সালে আন্দোলনরত জনগনের পোস্টারে স্লোগান ও মঞ্চ ব্যানার

১৯৬৯ : ১৯৫২ সালে বাংলা ভাষাকে কেন্দ্র করে পূর্ববাংলার ছাত্র-জনতার মধ্যে যে আন্দোলন শুরু হয় তা অব্যাহত থাকে। ১৯৬৯ সালে ছাত্র ও সাধারণ জনতা রাস্তায় নেমে পড়ে, এর কিছু কারণ ছিল। প্রথমত, পশ্চিম পাকিস্তান কর্তৃক শোষণ ও বঞ্চনা, অর্থনৈতিক শোষণ, অবিচার, অত্যাচার সাধারণ জন-জীবনে পশ্চিমা বিরোধী চেতনার বিকাশ ঘটায়। দ্বিতীয়ত, শেখ মুজিবসহ বাঙালি রাজনীতিবিদ, সামরিক অফিসার, সরকারী অফিসারদের বিরুদ্ধে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা দায়ের ও ক্যান্টনমেন্টের ভিতরে বিচারের নামে প্রহসন। তৃতীয়ত, বেতার ও টেলিভিশনে পুনরায় রবীন্দ্র সংগীত নিষিদ্ধ ঘোষণা। চতুর্থত, সরকার কর্তৃক আদিষ্ট হয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক বাংলা ভাষার তথাকথিত সংস্কারের পুনঃপ্রচেষ্টা। পঞ্চমত, আইয়ুবের দশ বছর শাসনকালকে সাফল্যের সময় বলে অতি বাড়াবাড়ি প্রচারণা। ১৯৬৯ সালের গোড়ার দিকে মাওলানা ভাসানী ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে পল্টন ময়দানে জনসভার আয়োজন করে। জনসভা শেষে বিক্ষুব্ধ জনগণ 'চল চল ক্যান্টনমেন্ট চল' স্লোগানসহ জঙ্গি মিছিল নিয়ে ক্যান্টনমেন্টের দিকে রওনা হয়। কারণ, এই সময় ঢাকা ক্যান্টনমেন্টে শেখ মুজিবসহ আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার আসামিরা বন্দি ছিল।

মাওলানা ভাসানী পল্টন ময়দানে আয়োজিত জনসভায় বিক্ষুব্ধ বাঙালিদের উদ্দেশ্যে বলেন, প্রয়োজনে করাচী বিপ্লবের মত জেলের তালা ভেঙে শেখ মুজিবকে নিয়ে আসবেন, সঙ্গে সঙ্গে জনতার মধ্য থেকে স্লোগান ওঠে 'জেলের তালা ভাঙব শেখ মুজিবকে আনব'। লাখো কণ্ঠের স্লোগানের এই আওয়াজ সমস্ত পল্টন এলাকা প্রকম্পিত করে তোলে। ২৩শে জানুয়ারি আওয়ামী লীগ নেতা হেদায়েতুল ইসলাম খান সহ আরো আওয়ামী লীগের নেতৃবৃন্দ বাঙালিদের বিভিন্ন দাবীর পক্ষে স্লোগানমুখর মিছিল বের করে। এই মিছিলে 'জয় নিপীড়িত মানুষের জয়'সহ বিভিন্ন স্লোগান লেখা প্ল্যাকার্ডের ব্যবহার দেখতে পাওয়া যায়। আগরতলা মামলার আসামী সার্জেন্ট জহুরুল হককে গুলি করে হত্যা করা হয়। ১৮ই ফেব্রুয়ারি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর অধ্যাপক সামসুজ্জোহাকে পাক সেনাবাহিনী গুলি করে ও বেয়নেট দিয়ে খুঁচিয়ে হত্যা করে। এর প্রতিবাদে ২০ই ফেব্রুয়ারি খুনী আইয়ুব শাহীর কারফিউ ভঙ্গ করে বিক্ষুব্ধ বাঙালি 'জেলের তালা ভাঙব শেখ মুজিবকে আনব', 'আগরতলা মিথ্যা মামলা প্রত্যাহার করো' ইত্যাদি স্লোগান লেখা পোস্টার ও প্ল্যাকার্ডের মিছিল করে (**চিত্র ০৬**)। ১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থানের সময় বাঙালির স্বকীয়তাবোধ যেমন তীব্রতর হতে থাকে তেমনি স্লোগানে এর প্রভাব পড়তে থাকে। এই সময় 'পাকিস্তান জিন্দাবাদ' স্লোগান হ্রাস পেতে থাকে, এর পরিবর্তে বিভিন্ন বিপ্লবাত্মক স্লোগানের জন্ম নেয়। এই সময় বিভিন্ন সভা সমাবেশে 'তোমার দেশ আমার দেশ, বাংলাদেশ বাংলাদেশ', 'জাগো বাঙালি জাগো', জ্বালো জ্বালো আগুন জ্বালো' ইত্যাদি স্লোগান ধ্বনিত হতে থাকে। ছাত্র আন্দোলন আরো তীব্র থেকে তীব্রতর হতে থাকে, বিক্ষুব্ধ ছাত্র নেতারা গুলিস্তানের জনসভায় কামানের ওপর দাঁড়িয়ে কামানের মত গর্জন করে স্লোগান দিতে থাকে 'আইয়ুব মানোয়েম ভাই ভাই, এক দড়িতে ফাঁসি চাই'। ১৯৬৯ সালের ডিসেম্বরের গোড়াতে পূর্ব পাকিস্তান সাংবাদিক ইউনিয়নের উদ্যোগে প্রেসক্লাবে আয়োজিত পেশাদার সাংবাদিক, সংবাদপত্রের প্রেস কর্মচারী, সংবাদপত্রে নিয়োজিত কর্মচারী ও হকারগণের বিক্ষোভ মিছিলের যোগাযোগ মাধ্যমের স্লোগান হয় 'সংবাদপত্রের স্বাধীনতা চাই', 'জরুরী অবস্থা প্রতাহার কর', 'সকল রাজবন্দীদের মুক্তি চাই'। ১৯৬৯-এর গণঅভ্যুথানের সময় আওয়ামী লীগ ও ছাত্রলীগের স্লোগান ছিল 'জেগেছে জেগেছে, বাঙালি জেগেছে', 'বীর বাঙালি জেগেছে, রক্তসূর্য উঠেছে'। ৫ই ডিসেম্বর হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর মৃত্যুদিবসে আয়োজিত স্মরণ সভায় শেওে বাংলা ও সোহরাওয়ার্দীর মাজারের পাশে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব পাকিস্তানের পূর্বাঞ্চলীয় প্রদেশের নাম পাকিস্তানের বদলে "বাংলাদেশ" রাখার সিদ্ধান্তের ঘোষণা করেন এবং দৃঢ়তার সঙ্গে বলেন,

চিত্র ০৬ : ১৯৬৯ সালে জনগণের শ্লোগান

> "বাংলার দুই কৃতি সন্তানের মাজারে দাঁড়াইয়া আজ শপথ গ্রহণ করিতেছি যে, আমরা সত্যিকারের পাকিস্তানি নাগরিক হিসাবে বাঁচিতে চাই, কারো গোলাম হিসাবে নয়।" (রহমান, ২০১৮)

চিত্র ০৭ : ১৯৬৯ সালে বার্তাবহনকারী ব্যনার (বাম), পোস্টার আঁকছে আর্ট কলেজের শিক্ষার্থী (ডান)

গণঅভ্যুত্থানের পোস্টার ও প্লেকার্ডে তৎকালীন ছাত্র সমাজের পূর্ণ স্বায়ত্বশাসনের দাবী ও শিক্ষার দাবীর প্রতিফলন দেখতে পাওয়া যায়, যা গণ-দাবীতে পরিনত হয় (চিত্র ০৭)। গণঅভ্যুত্থানের পোস্টার ও প্লেকার্ডে তৎকালীন ছাত্র সমাজের পূর্ণ স্বায়ত্বশাসনের দাবি ও শিক্ষার দাবির প্রতিফলন দেখতে পাওয়া যায়, যা গণ-দাবিতে পরিনত হয়।

১৯৭০ : এসময় রাজনৈতিক দলগুলো স্বৈরাচারী পাকিস্তানি সরকারের বিরুদ্ধে সংগঠিতভাবে তীব্র আন্দোলন গড়ে তোলে। এই সময় বিভিন্ন সমাবেশে ব্যবহৃত স্লোগান সমূহ বেশ জনপ্রিয়তা লাভ করে। এর মধ্যে কিছু কিছু জাতীয় স্লোগানে পরিণত হয়ে পড়ে, এই ক্ষেত্রে আমরা 'জয় বাংলা' স্লোগানের কথা উল্লেখ করতে পারি (চিত্র ০৮)। ১৯৭০ সালের পাকিস্তানের জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচনের তারিখ ঘোষিত হয়, এর ফলে সমস্ত দেশ নির্বাচনমুখি হয়ে পড়ে। প্রকৃত অর্থে এই নির্বাচনকে বাঙালিরা পশ্চিম পাকিস্তানিদের বিরুদ্ধে একটি বিদ্রোহ ও ক্ষোভ প্রকাশের অনন্য সুযোগে হিসাবে গ্রহণ করে।

চিত্র ০৮ : ১৯৭০ সালের নির্বাচনের প্রচারণা পোস্টার, ব্যানার

১৯৭০ সালের জানুয়ারি মাসের শেষ সপ্তাহ থেকে শেখ মুজিবুর রহমান নির্বাচনী প্রচারণা ও সাংগঠনিক তৎপরতার জন্য সারাদেশে ঝটিকা সফরে বের হন। তিনি সমগ্র পূর্ববাংলাকে স্বৈরাচারী শাসন-ব্যবস্থার বিরুদ্ধে ৬-দফা ভিত্তিক অধিকার অর্জনের স্বপক্ষে একটি ঐক্যবদ্ধ শক্তিতে পরিণত করার জন্য নির্বাচনে অংশগ্রহণ ও তার দল বাংলাদেশ আওয়ামী লীগকে নৌকা মার্কা প্রতীকে ব্যাপকভাবে ভোট দেওয়ার আহ্বান জানান। এই সকল সভা সমাবেশের স্লোগান ছিল 'নৌকা মার্কায় দিলে ভোট, শান্তি পাবে দেশের লোক', 'পদ্মা মেঘনা মধুমতি নৌকা ছাড়া নাইকো গতি', 'নৌকার মাঝি মুজিব ভাই আপনাদের কাছে দোয়া চাই, 'তোমার দফা আমার দফা ৬-দফা ১১-দফা', 'আওয়ামী লীগে দিয়া

ভোট, বীর বাঙালি বাঁধে জোট', 'স্বাধীনতার শপথ নিন, নৌকা মার্কায় ভাটে দিন', 'ভোট দিলে পাল্লায়, দেশ যাবে গোল্লায়', 'গাছের আগায় পক্ষী, শেখ মুজিব লক্ষ্মী' (চিত্র ০৮)। এ নির্বাচনে আওয়ামী লীগের অভূতপূর্ব জয়ের পিছনে জয় বাংলা স্লোগানটির ভূমিকা ছিল গুরুত্বপূর্ণ। অসহযোগ আন্দোলনের সময় এ স্লোগানটি এত জনপ্রিয় হয়ে উঠে যে, একজন রিক্সাওয়ালা কুশল বিনিময়ে 'জয় বাংলা' বলত। এই প্ল্যাকার্ডগুলা বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, পাকিস্তানিদের ২২ বছরের শোষণ থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য স্বায়ত্বশাসনের দাবী একমাত্র গণ-দাবীতে পরিণত হয়েছে। ১৯৭০-এর সাধারণ নির্বাচনে আওয়ামী লীগ এক ঐতিহাসিক পোস্টার প্রকাশ করে। পোস্টারটির পরিকল্পনা করেন আওয়ামী লীগ নেতা নুরুল ইসলাম এবং পোস্টারটি অঙ্কন করেন শিল্পী হাশেম খান (চিত্র ০৯)। ১৯৭০ সালের নির্বাচন ও নির্বাচনে আওয়ামী লীগের জয়লাভ মুক্তিযুদ্ধের একটি অন্যতম অনুঘটক হিসেবে মনে করা হয়। এই নির্বাচনে আওয়ামী লীগের জয়লাভের পিছনে অন্যতম কারণ হলো পূর্ব পাকিস্তানের প্রতি পশ্চিম পাকিস্তান যে 'অর্থনৈতিক শোষণ' চালিয়েছিল এরই ব্যাপক প্রচারণা। আর এই প্রচারণার মূলে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিল এই পোস্টোরটি। এই ঐতিহাসিক পোস্টারটি পশ্চিম পাকিস্তান কর্তৃক বাঙালির বলির শোষণের চিত্র তুলে ধরে যা সমগ্র বাংলায় ব্যাপক সাড়া জাগাতে সক্ষম হয়। এই পোস্টারে বাংলাদেশের প্রতি বৈষম্য ফুটে উঠেছিল।

সোনার বাঙলা শ্মশান কেন?

বৈষম্য বিষয়	বাঙলাদেশ	পশ্চিমপাকিস্তান
রাজস্ব খাতে ব্যয়	১৫০০ কোটি টাকা	৫০০০ কোটি টাকা
উন্নয়ন খাতে ব্যয়	৩০০০ কোটি টাকা	৬০০০ কোটি টাকা
বৈদেশিক সাহার্য্য	শতকরা ২০ ভাগ	শতকরা ৮০ ভাগ
বৈদেশিক দ্রব্য আমদানী	শতকরা ২৫ ভাগ	শতকরা ৭৫ ভাগ
কেন্দ্রীয় সরকারের চাকুরী	শতকরা ১৫ জন	শতকরা ৮৫ জন
সামরিক বিভাগে চাকুরী	শতকরা ১০ জন	শতকরা ৯০ জন
চাউল মণ প্রতি	৫০ টাকা	২৫ টাকা
আটা মণ প্রতি	৩০ টাকা	১৫ টাকা
সরিষার তৈল সের প্রতি	৫ টাকা	২'৫০ পয়সা
স্বর্ণ প্রতি ভরি	১৭০ টাকা	১৩৫ টাকা

চিত্র ০৯ : পূর্ব পাকিস্তানের প্রতি শোষেণের প্রচারণা

১৯৭১ : ১৯৭১ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে জাতীয় পরিষদের সমাবেশে স্বাধিকার আন্দোলনের শহীদদের রুহের মাগফেরাত কামনা করে মোনাজাত করা হয়। এই সমাবেশে কতগুলি পোস্টার দেখতে পাওয়া যায়। এই পোস্টোরগুলো বর্তমান সময়ে অর্থাৎ যারা মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস বা তথ্য বিকৃতি করতে চায় তাদের বক্তব্যকে মিথ্যা প্রমাণ করে। যেমন একটি প্রচারণা আছে যে, 'বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতা অধীনতা সমাজতন্ত্র চাননি, পরিস্থিতিতে পড়ে তাকে আর নয় মুক্তিযুদ্ধকে মেনে নিতে হয়েছে'। এ সময় বাঙালির সকল দাবি এক হয়ে একটি দাবিতে পরিণত হয় এবং তা হলো 'অধীনতা আর নয় চাই স্বাধীনতা' অর্থাৎ স্বায়ত্তশাসন দাবি থেকে এগিয়ে বাঙালিরা স্বাধীনতা দাবীতে পৌছে গেছে। এই একটি সমর্থনে কত বীর বাঙালি জীবন দিয়েছিল তা বলার অপেক্ষা রাখেনা। এটা যে দলীয় নয় 'জাতীয় স্লোগান' তার প্রতিফলন এই সময়ের পোস্টারে দেখা যায়। ১৯৭১ সালের মার্চে পুরো পূর্ববাংলা জুড়ে আন্দোলনের দাবি বেজে ওঠে। সমস্ত ঢাকা তখন মিছিল আর বিক্ষোভের শহরে পরিণত হয়। সে সময়কার পোস্টার ও প্ল্যাকার্ডগুলো সংরক্ষণ করা হয়নি। তবু কিছু আলোকচিত্র থেকে যতটুকু সম্ভব চিত্র আনার চেষ্টা করা হয়। স্বাধীন বাংলার পতাকা সম্বলিত নানা প্ল্যাকার্ড দেখতে পাওয়া যায়। সমাজের সকল শ্রেণির মানুষ, নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সকলের অংশগ্রহণ মিছিলে লক্ষণীয় (চিত্র ১০)। স্বাধীনতার দাবির পূর্ণতা এই সময়কাল থেকে দেখতে পাওয়া যায়। মুক্তি সংগ্রামে মা-বোনেরা যে তাদের বুকের তাজা রক্ত ঢেলে দিয়েছেন তার প্রমাণও এই পোস্টারে পাওয়া যায়।

চিত্র ১০ : নানা প্ল্যাকার্ডে সজ্জিত সমাজের সকল শ্রেণীর মানুষের অংশগ্রহণে মিছিল

১৯৭১-এর ২৫ই মার্চ থেকে নয় মাসব্যাপী বাংলাদেশজুড়ে পাকিস্তানি বাহিনী যে নির্মম গণহত্যাযজ্ঞ, ধ্বংসযজ্ঞ ও নারীর প্রতি নিগ্রহযজ্ঞ চালায়, তার মূল নির্দেশদাতা ও পরিকল্পনাকারী ছিলেন পাকিস্তানের খোদ প্রেসিডেন্ট অর্থাৎ জেনারেল ইয়াহিয়া। সুতরাং শিল্পী কামরুল হাসান তাঁর ব্যঙ্গাকৃতির মুখাবয়বে ফুটিয়ে তোলেন ১৯৭১-এর সব নিষ্ঠুরতা, অমানবিকতা ও ধ্বংসের প্রতীকী রূপ। মুক্তিযুদ্ধের মতো এক বিশাল প্রতিরোধযজ্ঞে একটি পোস্টার বা একটি শিল্পকর্মও কত শক্তিশালী হয়ে উঠেছিল, এটাই তার বাস্তব প্রমাণ। রাজনৈতিক তাৎপর্যের বিশেষত্ব ছাড়াও অঙ্কিত চিত্রটি নান্দনিক পরিশীলনে উন্নত শিল্পকর্মের মর্যাদায় ভূষিত। এই পোস্টার ১৯৭১ সালের মে মাসে প্রথমে

কলকাতা থেকে জয় বাংলা পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। তারপর ওই মাসেই বাংলাদেশের প্রবাসী সরকার এক রঙে এর লক্ষাধিক কপি ছাপিয়ে মুক্তাঞ্চলে বিলি করে। কিছুদিন পরে বিদেশিদের উদ্দেশ্যে প্রচারিত এই পোস্টারের ইংরেজি ভাষ্যের বক্তব্য ছিল : 'Annihilate the Demons'। এখানে দানব আকারে দেখানো হয় ইয়াহিয়াকে, যা প্রকৃত অর্থে পুরো হানাদার বাহিনীর নগ্ন চরিত্রের পরিচয় বহন করে (চিত্র ১১)। এই চিত্রটি দিয়ে পোস্টার ছাপিয়ে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। এ পোস্টার চিত্রটি পাকিস্তানী বর্বর সেনাবাহিনী এবং তাদের এদেশীয় দোসরদের বিরুদ্ধে জনসাধারণের মধ্যে ঘৃণা আর বিদ্রোহের উদ্রেক বাড়িয়ে দেয় বহুগুণে।

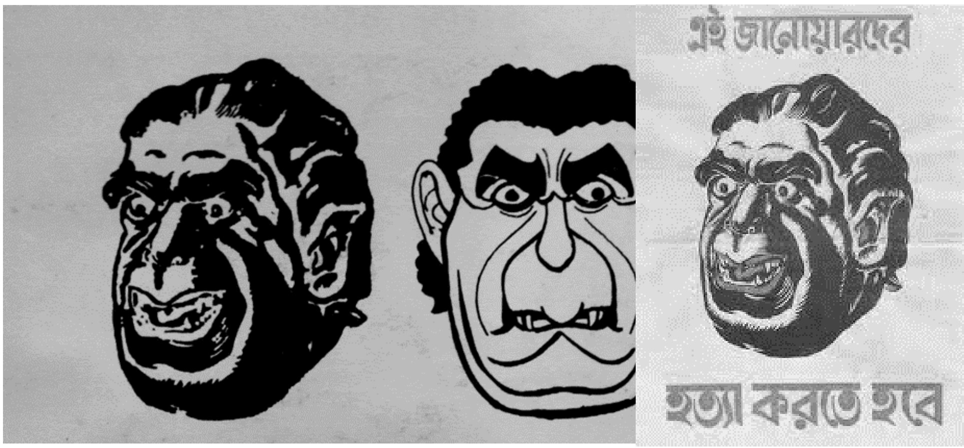

চিত্র ১১ : দানব আকারে দেখানো ইয়াহিয়ার ছবি একেঁছেন শিল্পী কামরুল হাসান

'এবারের সংগ্রাম মুক্তির সংগ্রম' পোস্টারটি এঁকেছিলেন শিল্পী কামরুল হাসান (চিত্র ১২-ক)। যার নেতৃত্বে এক হয়েছিল বাংলাদেশের সব মানুষ, যিনি এক ৭ই মার্চের ভাষণে উত্থান-পাত্থাল করেছিলেন বাংলাদেশের মানুষের হৃদয়ে রক্তের স্রোত, ঘরে ঘরে দূর্গ গড়ে তোলার আহবানে সাড়া দিয়েছিল বাংলার মানুষ, সেই বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে এ পোস্টারে। 'সদা জাগ্রত বাংলার মুক্তিবাহিনী' এঁকেছেন শিল্পী নিতুন কুন্ডু। দিন-রাত, সকাল-সন্ধ্যা, শীত-গ্রীষ্ম কোনো কিছুর তোয়াক্কা না করে নিজের বুকের রক্ত বিলিয়ে স্বাধীনতা এনেছেন যেই মুক্তিযোদ্ধারা তাদের দৃঢ়, সংকল্প অনমনীয়তা যেন প্রকাশ পায় এ পোস্টারে। শিল্পী নিতুন কুন্ডুর আর একটি পোস্টার 'বাংলার মায়েরা মেয়েরা সকলেই মুক্তিযোদ্ধা' (চিত্র ১২-খ)। মুক্তিযুদ্ধে এদেশের নারীদের অবদানের কথা অনস্বীকার্য। নারীদের এ অবদানের কথা অস্বীকার করার সুযোগ বা সাহস কারো নেই। চার লক্ষ নির্যাতিত বাংলাদেশি নারী ছাড়াও সরাসরি যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছেন এমন অগণিত মুক্তিযোদ্ধার অবদানই তো আমার বাংলাদেশ। লাখো মা-বোনের সম্মানহানির বিনিময়ে, অর্জিত হয় বাংলার স্বাধীনতা। 'বাংলার হিন্দু, বাংলার খ্রিস্টান, বাংলার বৌদ্ধ, বাংলার মুসলমান আমরা সবাই বাঙালি' (চিত্র ১২-গ)। বাংলাদেশ সব সময়ই ধর্মীয় ভাবনায় সংকীর্ণ না থেকে এক হওয়া এক দেশ। কাঁধে কাঁধ লাগিয়ে লড়ে যাওয়া মুক্তিযুদ্ধেও এক হয়েছে যে দেশের সব ধর্মের মানুষ। সবাই মিলেই তো এই দেশ, এই জাতি, আমরা বাংলাদেশি। 'মুক্তিবাহিনী আপনার পাশেই আছে' আঁকেন শিল্পী কামরুল হাসান। শিল্পী বিরেন সোমের আঁকা 'স্বাধীনতা, না হয় মৃত্যু' দেশ রক্ষায় ঝাঁপিয়ে পড়া লাখ মানুষের মনে একটাই কথা ছিল, ছিনিয়ে আনবে স্বাধীনতা, প্রয়োজনে নিজের জীবনের বিনিময়ে'। 'একেকটি বাংলা অক্ষর অ আ

ক খ একেকটি বাঙালির জীবন' আঁকেন শিল্পী কামরুল হাসান ও নাসির বিশ্বাস (চিত্র ১২-ঘ), 'মুক্তিযোদ্ধাদের সাহায্য করুন' (চিত্র ১২-ঙ), 'বাংলাদেশের কৃষক শ্রমিক ছাত্র যুবক সকলেই আজ মুক্তিযোদ্ধা' আঁকেন শিল্পী বিরেন সোম ও প্রাণেশ মন্ডল (চিত্র ১২-চ)। যেকোনো আন্দোলনে চিত্রকলা বা পোস্টারও যে প্রতিবাদের অনেক বড় হাতিয়ার হতে পারে এবং অবদান রাখতে পারে বিজয়ে তারই প্রমাণ করে আমাদের মুক্তিযুদ্ধ।

(ক)

(খ)

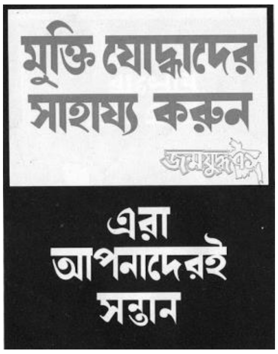

(গ)

(ঘ)

(ঙ)

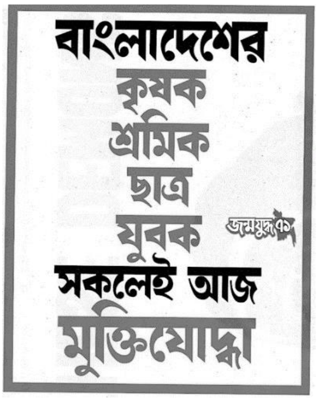

(চ)

চিত্র ১২ : মুক্তিযুদ্ধের সময়ে প্রকাশিত বিভিন্ন প্রচারণার পোস্টার

একাত্তরের এই শৈল্পিক প্রয়াস সম্পর্কে জানতে কথা হয় বরেণশিল্পী হাশেম খানের সঙ্গে। তিনি বলেন, 'বঙ্গবন্ধুর নির্দেশ অনুযায়ী শিল্পীরা একাত্তরে নিজেদের করণীয় ঠিক করেছিলেন। সে অনুযায়ী লিফলেট পোস্টার ইত্যাদি আঁকার কাজ করেন তারা। এসব শিল্পকর্ম দেখার মধ্য দিয়ে সময়কে দেখা যায়। অল্প পরিসরে হলেও, জানা যায় ইতিহাসকে।'

যোগাযোগ মাধ্যমের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করেন মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের ট্রাস্টি। তিনি বলেন, 'মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস নানা মাধ্যমে ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা হয়েছে। একই প্রয়াস লক্ষ্য করা যায় পোস্টার লিফলেট পুস্তিকা ও প্রচারপত্রে। যুদ্ধদিনের অনেক খুঁটিনাটি এর মাধ্যমে উঠে এসেছে। আজকের দিনে প্রকাশনাগুলো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ স্মারক। তবে এগুলো নিয়ে বিশেষ কোনো গবেষণা হয়নি। এ কাজটির উপর জোর দিয়ে তিনি বলেন, গবেষণা হলে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রয়াসগুলো থেকে ইতিহাসের অনেক বড় উপাদান উদ্ধার করা সম্ভব হতে পারে।'

উপসংহার

আমাদের মুক্তিসংগ্রাম অনেক সঙ্কটসংকুল পথ অতিক্রম করে শেষে সাফল্যের দ্বারপ্রান্তে উপনীত হয়েছে। এসেছে বিজয়। শিল্পীদের আঁকা এসব পোস্টার-ব্যানার মুক্তিযুদ্ধের সময় সাধারণ মানুষ থেকে মুক্তিযোদ্ধাদের আবেগতাড়িত করেছে, প্রতিরোধ চেতনায় উদ্দীপ্ত করেছে। এ পোস্টার চিত্রগুলো মুক্তিযুদ্ধের চেতনার স্মারক, অমূল্য ঐতিহাসিক দলিল। বর্বর পাকবাহিনীর ভারি অস্ত্র সস্ত্র ও গোলাবারুদের বিপরীতে আমার বাংলা মায়ের মুক্তি পাগল দামাল সন্তানরা যেভাবে রণাঙ্গনে মোকাবেলা করেছিল তা অবিস্মরণীয় ও চিরস্মরণীয় দলিল হিসেবে থাকবে মহাকালের সাক্ষী হয়ে। বিভিন্ন আঙ্গিকে আমাদের শিল্পী যোদ্ধারা যে রণকৌশল প্রয়োগ করেছিলেন তারই কিছু অংশ বর্ণনা করতে ক্ষুদ্র প্রয়াশ এই গবেষণা প্রবন্ধের মাধ্যমে। সমাজে যে কোনো রুচি সংকটকালে রুচিহীনতা, অপসংস্কৃতির আগ্রাসন থেকে সমাজকে বাঁচাতে এ দেশের শিল্পী সমাজ বরাবরের মতই এগিয়ে আসবে সুশীল স্বপ্ন বাস্তবায়নে- এটাই প্রত্যাশা।

তথ্যসূত্র

আর্টস.বিডিনিউজ.২৪ (মার্চ ৩০, ২০১৫), স্বাধীনতা সংগ্রামে চিত্রশিল্পীসমাজ।

[Viwed 14 January, 2022]. Available from: https://arts.bdnews24.com/archives/6487

আহমেদ, কবীর (ফেব্রুয়ারি ১৮, ২০২২), ভাষা আন্দোলনের পোস্টার, কালের কণ্ঠ।

বাংলাপিডিয়া, খন্ড ১৩ (মার্চ ১৯, ২০১৫), সাতই মার্চের ভাষণ।

বাংলাদেশ মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর আর্কইভ প্রদর্শন [Viwed 05 January, 2022].

রহমান, সিদ্দিকুর (২০১৮), বাংলাদেশের গণ-আন্দোলন স্লোগান প্ল্যাকার্ড ও পোস্টার, ঢাকা: একুশে প্রিন্টার্স, ৩য় মুদ্রণ।

সিদ্দিকা, আখিঁ (ডিসেম্বর ২৪, ২০১৮), চিত্রশিল্পীরা যখন চিত্রযোদ্ধা; শিল্প ও সাহিত্য।

সোম, বীরেন (২০১৫), বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে শিল্পী সমাজ, ঢাকা: কিউ প্রিন্টার্স, প্রথম প্রকাশ।

হোসাইন, এমরান (ফেব্রুয়ারি ২১, ২০২২), ভাষা আন্দোলন ও বঙ্গবন্ধু, বাংলা টিবিউন।

[Abstract: The liberation war of 1971 is the most important chapter in the history of independent Bangladesh. In exchange for the blood of three million people, we have achieved independent, sovereign Bangladesh. The background of the 1971 liberation war of Bangladesh was created in 1947 when India was divided into two states called India and Pakistan. In 1952, through the national language movement, independence consciousness emerged among Bengalis. One by one came the six-point movement of '66, the mass-coup of '69, the general election of '70, Bangabandhu's declaration of war against the Pakistanis in his historic speech of March 7, 1971, and finally our victory on December 16, 1971. Bengali creativity in song, poetry, painting, and cinema was bursting in that tumultuous time. Our artists like Zainul Abedin, Kamrul Hasan, Nitun Kundu, Pranesh Mondal, Devdas Chakraborty and the painters of the seventies used their canvas properly through visual media like festoons, banners, posters. The artists of that time spread the flame of freedom among seven crore Bengalis by painting the canvas with paint. However, our liberation war proves that painting or line can be a great tool of protest in any movement and can contribute to victory. The main aim of this research paper is to make the new generation of Bangladesh curious about the tasteful painting practice free from bad culture by observing and reviewing the history of the tactics applied by the artist fighters in our liberation war.]